সম্ভাব্য করণীয়

- ☑ একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করে পদ্মার সাথে মাথাভাঙ্গা আর মাথাভাঙ্গার সাথে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সকল নদীর সংযোগ করে উজানের প্রবাহের সাথে ভাটি অঞ্চলের প্রবাহবন্ধন তৈরী করা।
- ☑ বর্ষা মৌসুমে বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে বন্যার পানি প্রবেশের সুযোগ করে দেয়া।
- ☑ পর্যায়ক্রমে বিদ্যমান বাধ ব্যবস্থাপনার ধারণা থেকে সরে এসে উন্মুক্ত প্লাবণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।
- ☑ পানি ব্যবস্থাপনায় পলি ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা।
- ☑ উন্মুক্ত প্লাবণ নীতির সাথে খাপ খাইয়ে জনপদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা।
- ☑ মাছসহ সমস্ত জলজ প্রাণীর বিচরণ ক্ষেত্র উন্মুক্ত করার জন্য অপ্রয়োজনীয় স্লুইজ গেট এবং বাধ অপসারণ করা।
- ☑ পানি প্রবাহে বাঁধা সৃষ্টিকারী সকল অবৈধ বাধ ও স্থাপনা অপসারণ করা।
- ☑ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ কে বিবেচনায় রেখে নদীর দূষণ ও দখলমুক্তকরণে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ☑ ১৯৯৫ সালের জলাশয় ইজারা সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নদী-খাল ইজারা বন্ধ করা।
- ☑ নদীর সঠিক সীমানা নির্ধারণ করে সীমানা সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এগিয়ে আসা।
- ☑ সকল সংযোগ খালকে লীজমুক্ত ও দখলমুক্ত করে নদীর সাথে সংযোগ করে দেয়া এবং প্রবাহের সাথে আসা পলি খালের মাধ্যমে বিলে অবক্ষেপণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- ☑ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগে নদী সংরক্ষণে এগিয়ে আসা।
- ☑ লোকায়ত জ্ঞানকে গুরুত্ব দিয়ে (যেমন অষ্টমাসী বাধ), এলাকার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিবেচনায় রেখে নদী সংরক্ষণে যে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা।

শেষ কথা

মাথাভাঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এ অঞ্চলের সংস্কৃতি, কৃষি ব্যবস্থা, জীববৈচিত্র্য, সর্বোপরি পরিবেশ-প্রতিবেশ সুরক্ষায় নদীকে প্রবাহমান করবার কোনে বিকল্প নেই। দখল-দূষণ-ভরাটমুক্ত করে নদীটির সাথে মূল পদ্মার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে নদীটি দিয়ে উজানের পানির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেই সাথে মাথাভাঙ্গা নদীর সকল অবৈধ স্থাপনা ও জবরদখল উচ্ছেদ এবং এর পাশাপাশি নদীর সংযোগ খালগুলোকে ইজারা মুক্ত করে খালগুলোতে প্রবাহ ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। আর এর মধ্যদিয়েই হয়তো আমরা মাথাভাঙ্গা নদীর স্বাভাবিক প্রকৃতি ফিরিয়ে আনতে পারবো। আসুন সবাই মাথাভাঙ্গা নদীসহ সকল নদী রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হই।

প্রচারে :
বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)
ও মাথাভাঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন

আসুন মাথাভাঙ্গা নদী সংরক্ষণে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলি

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)
খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়
বাড়ী-১৮১, রোড-১, নিরালা আ/এ, খুলনা।
যোগাযোগ: ০১৭১৬৯৭২৫১৭,০১৬৩৬-০৯১৩৩১
E-mail: belakhulna2013@gmail.com, mukulkln@gmail.com

শুরুর কথা

মাথাভাঙ্গা এক সময়কার স্রোতস্বিনী আন্তঃসীমান্ত নদী। ১৮৬২ সালে কলকাতার সঙ্গে এ অঞ্চলের রেল যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার পূর্বে এটি ছিল অঞ্চল দু'টিতে যোগাযোগের একমাত্র পথ। একসময় এই মাথাভাঙ্গা নদীর প্রবাহ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নদীসমূহ যেমন ভৈরব, কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা, কপোতাক্ষ ইত্যাদি নদীগুলো উজ্জীবিত ছিল। আজ সেই মাথাভাঙ্গা নদী পরিণত হয়েছে মরা খালে। গত ২৫০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, মূল নদী পদ্মার পানি প্রবাহের মাত্রার উপর নির্ভর করে প্রকৃতির নিয়মেই নদীটিতে কখনো পলি পড়ে নাব্যতার সংকট তৈরি হয়েছে, আবার কখনো হয়ে উঠেছে খরস্রোতা। আন্তঃসীমান্ত নদীটিতে প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম মনুষ্য হস্তক্ষেপ ১৯৭৫ সালে বাস্তবায়িত ফারাক্কা ব্যারেজ, যার মাধ্যমে পদ্মায় পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ফলে মাথাভাঙ্গায় নাব্যতার সংকট একটি স্থায়ী রূপ লাভ করে। এই সংকটে একে একে নতুন মাত্রা যোগ করেছে অবৈধ দখল, অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ, নদীটি ব্যবহার করে বর্জ্য অপসারণের মতো নানা ধরনের অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকান্ড। ফলশ্রুতিতে মাথাভাঙ্গায় পানি ও বায়ু দূষণের দৃশ্যমান প্রভাব পড়ছে জনস্বাস্থ্য ও কৃষি উৎপাদনে। নদীটি একদিকে যেমন আমাদের সংস্কৃতিকে ঐতিহ্যগতভাবে ধারণ করছে ঠিক তেমনি এ নদী আমাদের পরিবেশ-প্রতিবেশ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় কার্বন সিংক হিসেবে কাজ করছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে যথাযথ সংস্কার ও দখল-দূষণের হাত থেকে নদীটিকে রক্ষার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন এবং সম্মিলিত উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই।

মাথাভাঙ্গা নদী

বাংলাদেশ-ভারতের যে কয়টি আন্তঃসীমান্ত নদী আছে তার মধ্যে মাথাভাঙ্গা অন্যতম। নদীটি ভারতে পদ্মা থেকে উৎপত্তি হয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া ও হাটাভাঙ্গা গ্রামের মাঝ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে কুমার নামের একটি শাখা নদীর জন্ম দিয়ে ৪১টি গ্রাম পেরিয়ে দামুহুদা উপজেলার সুলতানপুর গ্রামের পাশ দিয়ে নদীয়া জেলায় প্রবেশ করেছে, যেখানে নদীটি চূর্ণী নামে পরিচিত। বাংলাদেশ অংশে চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত ১২১ কি.মি. দৈর্ঘ্যের এই নদীর সাথেই জড়িয়ে আছে কুমার, ভৈরব, কপোতাক্ষ, নবগঙ্গা, চিত্রাসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নদীসমূহ।

মাথাভাঙ্গার বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে মাথাভাঙ্গা একটি বড় খালের আকারে তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই নদীটি প্রাকৃতিক ডাস্টবিন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে দখল হয়ে গেছে নদীর সীমানা। যে সংযোগ খাল দিয়ে পলিবাহিত স্রোতধারা বিলে বা লোকালয়ে পৌছে যেতো, সেই খালগুলির উৎসমুখ বন্ধ করে সেখানে অন্য প্রকল্প গ্রহণ করে প্রবাহে বাঁধা সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে নদীর বুকেই পলি অবক্ষেপিত হয়ে একদিকে তলদেশ ভরাট হয়ে নদী নাব্যতা হারিয়েছে, অন্যদিকে ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়েছে নদীর প্রশস্ততা, যা নদীখেকোদের অবৈধ দখলের সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে। নাব্যতার সংকটের ফলে যেমন কৃষি উৎপাদনে পানির সংকট তৈরী হয়েছে, তেমনি এলাকায় জলাবদ্ধতার প্রবণতা বাড়ছে। অথচ এক সময় এই নদীটিকে পদ্মা, মেঘনা বা যমুনার সাথে তুলনা করা হতো। ১৯৭১ সালেও উপজেলার দর্শনা পয়েন্টে মাথাভাঙ্গা নদীর পানি প্রবাহের সর্বো"চ রেকর্ড ছিল ১২ হাজার ৯০০ কিউসেক যা দেশের বড় বড় নদীগুলোর পানি প্রবাহের চাইতে কোনো অংশে কম নয়।

মাথাভাঙ্গার সংকটের কারণ

- মাথাভাঙ্গা নদীর উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যাওয়া
- গঙ্গা নদীর গতিমুখ পরিবর্তন হওয়া
- উজানের পানি প্রবাহ না থাকা
- শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানি প্রত্যাহার
- মাথাভাঙ্গা নদীর সাথে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নদীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া
- অপরিকল্পিত স্লুইজ গেট ও বাধ ব্যবস্থাপনা
- পার্শ্ববর্তী কৃষিভূমি ও জনপদে পলি অবক্ষেপণের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা বাঁধাগ্রস্থ করা
- নদীর সংযোগ খালগুলোকে নদী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এবং সেই খালগুলোর শ্রেণী পরিবর্তন করে অন্য প্রকল্পে ব্যবহার করা।

মাথাভাঙ্গার সংকটের প্রভাব

১. কৃষি কাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। যেমন কৃষিতে পানির অপ্রতুলতা, পাট ভেজাতে পানির সংকট
২. নদীটির পানি ধারন ক্ষমতা কমে যাওয়ায় জলাবদ্ধতা বেড়েছে
৩. কৃষি পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য পরিবহণে সংকট তৈরী হয়েছে, ফলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে
৪. এক সময় খাবার পানি হিসেবেও এই পানি ব্যবহার হতো। এখন গৃহস্থালী কাজেও এই পানি ব্যবহার করা যাচ্ছে না
৫. নদীতে কঠিন ও তরল বর্জ্য ফেলাতে জনস্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।